

আফতাব উদ্দিন ছিদ্দিকী রাগিব ▽

প্রশ্ন ফাঁস না শিক্ষাব্যবস্থার গলায় ফাঁস

একটা সময় ছিল, নকল ছাড়া পাবলিক পরীক্ষা ছিল অকল্পনীয়। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী দেখিয়েছেন, নকলমুক্ত পরীক্ষা চাইলে এ দেশেও সম্ভব। নকলের স্থানটা এখন প্রশ্ন ফাঁসের দখলে। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা, তিনি এবার পরীক্ষাগুলোকে 'প্রশ্ন ফাঁস'মুক্ত করবেন। জাতিকে প্রশ্ন ফাঁসের ফাঁস থেকে উদ্ধার করবেন। দেশের শিক্ষাকে কলঙ্কমুক্ত করবেন। আর সেটা সম্ভব, যদি বিদ্যমান প্রশ্ন প্রণয়ন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কঠোর নজরদারিতে 'ফাঁসমুক্ত' করা যায়। সম্ভব যদি প্রশ্ন ফাঁসকারীদের গলায় সর্বোচ্চ দণ্ডের ফাঁস পরানো যায়

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন প্রশ্ন ফাঁস নামের 'কালাজ্বরে' আক্রান্ত। বোর্ড পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষা, চাকরির পরীক্ষা—সে যাই হোক, কিছু পরীক্ষার্থী আগে প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছে। সেটা কখনো পুরো প্রশ্নপত্র, কখনো বা আংশিক। অর্থের বিনিময়ে কখনো সরাসরি, কখনো প্রযুক্তির বরাতে (ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ভাইবারে) প্রশ্ন পৌঁছে যাচ্ছে পরীক্ষার্থীদের হাতে হাতে বা ল্যাপটপ-মোবাইলে। এই 'প্রশ্ন ফাঁস' হয়ে উঠছে শিক্ষাব্যবস্থার গলার কাঁটা। চলমান এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে গণিত পরীক্ষার আগের রাতেই প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কেউ কেউ পরের দিন সকালে পায় প্রশ্ন। যার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় আসল প্রশ্নের। এর আগে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও ইংরেজি প্রথম পত্রের সময়ও একই অভিযোগ ওঠে। বিষয়টিকে দুরারোগ্য বলছি, কারণ রোগটি ওষুধে সারছে না। ওষুধের নাম ১৯৮০ সালের পাবলিক 'পরীক্ষা (অপরাধ) আইনের ৪ ধারা। ওই আইনে প্রশ্ন ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ দণ্ডনীয় অপরাধ। যার সাজা জরিমানাসহ তিন থেকে দশ বছর কারাদণ্ড। অবিশ্বাস্য হলো, আইনটি পাসের ২৭ বছরেও এ আইনে কারো সাজা হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। আরো অবিশ্বাস্য হলো, ২০১৫ সালের প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ায় প্রশ্ন ফাঁসের সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করা হয়। অথচ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা এখন নিয়মিত। লক্ষণীয় হলো, ২০১৫ সালের ২০ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। প্রশ্ন ফাঁসের সাজা কমানোয় তখন সমালোচনার ঝড় ওঠে। বাধ্য হয়ে তখন আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পরিমার্জনের কথা বলে এক সপ্তাহের মধ্যে খসড়াটি সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর ১৬ মাস গেল। অথচ আইন বাদ, খসড়াটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। এ রকম একটা জঘন্য অপরাধে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন আত্মঘাতী হয় তাহলে সমাধানটা কোথায়? সত্যি বলতে কী, এ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার কার্যকর কোনো সুরাহা হয়নি। প্রতিটি অঘটনের দৌড়

তদন্ত কমিটি, সুপারিশ, দু-চারজন গ্রেপ্তার পর্যন্ত। আর এগোয় না বিষয়টি। কারা, কিভাবে কাজটি করে বা করছে, তা কখনো জানা যায়নি। হোতারা জামিনে বেগিয়ে আরো বীরদর্পে তাদের অপকর্ম চালায়। পত্রিকার এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে গত ছয় বছরে (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) রাজধানীতে দায়ের হওয়া ৭০টি মামলায় কোনো আসামির সাজা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ একটি মামলাও প্রমাণ করতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়, ১১ মামলায় সব আসামিই অব্যাহতি পায়। বাকি মামলায় বেশির ভাগ আসামি মামলা থেকে অব্যাহতি ও খালাস পায়। অনেক আসামি জামিন নিয়ে আর আদালতে হাজিরা পর্যন্ত দেয় না। ওই ৭০টি মামলার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আদালতের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, 'অভিযোগ গঠনের উপাদান না পাওয়ায় আসামিদের মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।' ওই ৭০টি মামলার বেশির ভাগই হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতির অভিযোগে (প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫)। পরিহাস হচ্ছে, সরকার প্রশ্ন ফাঁস ঠেকাতে তো পারছেই না, উল্টো অভিযোগ উঠলেই দায়িত্বশীল মহল বেশির ভাগ সময় বিষয়টিকে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রেস কনফারেন্স, আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগকে সরকার মিথ্যা ঘোষণা করে। যেমনটি হয়েছিল ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে। ওই সময় মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠল। একাধিকজন প্রশ্ন ও উত্তরপত্রসহ গ্রেপ্তার হলো। তার পরও সরকার অভিযোগ অস্বীকার করল। ওই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে তখন বিভিন্ন মহলের কত প্রতিবাদ! ভর্তিবিধিভেদে কত মিছিল-মিটিং, আন্দোলন। কিন্তু সব 'লব ডক্ক'। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর কণ্ঠে এবার ভিন্ন সুর। তিনি বলেছেন, 'প্রমাণ মিললে চলতি এসএসসির গণিত পরীক্ষা বাতিল করা হবে।' তবে সেখানে তিনি কিছু 'কিন্তু' জুড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, প্রশ্ন কখন ফাঁস হয়েছে, কিভাবে কতটুকু ফাঁস হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব কতখানি পড়েছে, তা খতিয়ে দেখার পর পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া

হবে (কালের কণ্ঠ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যায়, ওই অভিযোগ কখনো প্রমাণিত হবে না। এসএসসির ফল প্রকাশ পেলে হয়তো দেখা যাবে, ফাঁসকৃত প্রশ্ন পাওয়া পরীক্ষার্থীরাও জিপিএ ৫ বা গোল্ডেন জিপিএ ৫ পেয়েছে। তারপর হয়তো একদিন, 'জিপিএ' বা 'এসএসসি' মানে কী জিজ্ঞেস করলে বলবে, 'জানি না'। কিংবা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কবে বা 'রাষ্ট্রপতির নাম' জানতে চাইলে তাও বলবে 'স্মরি, জানি না'। 'আমি জিপিএ ৫ পেয়েছি'—এর ইংরেজি অনুবাদ বলবে, 'I am GPA 5', 'I gave GPA 5'। বলবে, 'স্বাধীনতা দিবস হলো ১৬ ডিসেম্বর', 'বিজয় দিবস হলো ২৬ ডিসেম্বর', 'জাতীয় সংগীতের রচয়িতা নজরুল ইসলাম', 'পিথাগোরাস একজন ঔপন্যাসিক ইত্যাদি ইত্যাদি...। (তথ্যসূত্র : মাছরাঙা টিভির জিপিএ ৫-বিষয়ক প্রতিবেদন)। এ অবৈধ পন্থায় পাসের পরিণতি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। ওই পন্থার পথিকরা ভবিষ্যতেও সব পরীক্ষার (প্রাতিষ্ঠানিক বা চাকরিজনিত) বৈতরণী একই পন্থায় পার হতে চাইবে। এমনকি অন্যদেরও বিপথগামী করবে। এই বিপথগামিতা একটা সূত্র ও অগ্রসর শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু ধ্বংস বা জাতিকে মেধাশূন্য করাই নয়; এই সাধারণ, নিরীহ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। দুর্ভাগ্য, সেই প্রশ্ন ফাঁসই এখন আমাদের নিয়তি। তার পরও আমরা আশাবাদী। একটা সময় ছিল, নকল ছাড়া পাবলিক পরীক্ষা ছিল অকল্পনীয়। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী দেখিয়েছেন, নকলমুক্ত পরীক্ষা চাইলে এ দেশেও সম্ভব। নকলের স্থানটা এখন প্রশ্ন ফাঁসের দখলে। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা, তিনি এবার পরীক্ষাগুলোকে 'প্রশ্ন ফাঁস'মুক্ত করবেন। জাতিকে প্রশ্ন ফাঁসের ফাঁস থেকে উদ্ধার করবেন। দেশের শিক্ষাকে কলঙ্কমুক্ত করবেন। আর সেটা সম্ভব, যদি বিদ্যমান প্রশ্ন প্রণয়ন ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কঠোর নজরদারিতে 'ফাঁসমুক্ত' করা যায়। সম্ভব যদি প্রশ্ন ফাঁসকারীদের গলায় সর্বোচ্চ দণ্ডের ফাঁস পরানো যায়।

লেখক : আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
aftabragib@yahoo.com